অন্নদামঙ্গল কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ

মঙ্গলকাব্যের বিকাশ তুর্কি আক্রমণোত্তর পালাবদলের পটভূমিতে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তখন নৈরাজ্যের মুখে অসহায়। এই অসহায়তাই এক সময় প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নতুন করে শুরু হয়েছিল আত্মসংরক্ষণের প্রক্রিয়া। ঐতিহ্য পুনরুত্থানের সচেতন প্রয়াস। আত্মহারা দেশ ও জাতিকে পূর্ব-ঐতিহ্যে সংস্থাপিত করতে পুরাণ-মনস্কতা প্রবল হয়েছিল। সমকালীন সাহিত্যে পৌরাণিক ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের কারণ এটাই।

মঙ্গলকাব্য রচনার উৎসে পৌরাণিক প্রেরণা এই ঐতিহ্যমুখিনতারই ফল। মুখ্যত দেবখণ্ড এবং অংশত নরখণ্ডকে আশ্রয় করে এর বিস্তার। ভারতচন্দ্র রাজসভাকবি এবং সংস্কৃত কাব্য-পুরাণে ছিল তাঁর বিশেষ অধিকার ; আর ছিল বৈদগ্ধ্য, রুচিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়বিলাসের পাশাপাশি এক অভিনব আধুনিক মন। তবু পূর্ব ঐতিহ্যের টানকে অস্বীকাব করতে পাবেননি তিনি। স্বভাবতই তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অংশে পুরাণ চেতনার অভিপ্রকাশ ঘটেছে নিখুঁতভাবে। পূর্বসূরির মতো তিনিও বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন। প্রথমেই **গণেশ বন্দনা** করেছেন। পুরাণে বিঘ্নরাজ গণেশ সম্পর্কে যে সংস্কার ও কাহিনী প্রচলিত আছে তাকে অবলম্বন করে শঙ্করাচার্য 'গণেশধ্যান' রচনা করেছিলেন :

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্মাদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্ ॥
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরঃ শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদংকামদম্ ॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশের 'গণেশ বন্দনা'-য়-এর হুবহু অনুসরণ ঘটেছে—

গণেশায় নমঃ নমঃ আদি ব্রহ্মনিরূপম
পরমপুরুষ পবাৎপর।
খর্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর ॥...

শিববন্দনা-য় দেখা যায় পৌরাণিক শিবের যে মহিমা স্কন্দপুরাণেব কাশীখণ্ডে নানা ভাবে বলা হয়েছে ভারতচন্দ্র সেগুলিকে যথাসম্ভব স্পর্শ করেছেন। যেমন তিনি সর্বরোগ-তাপ-শোক হরণকারী। তাঁর কৃপায় চতুবর্গদান সম্ভব। পৌরাণিক idea এখানে অক্ষুন্ন।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥
হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর ॥

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডের এক-পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে কেশবাদিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগাশ্চত শো শ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

অর্থাৎ 'সাতজন্মে আমি আজন্ম যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, মাকরী, সপ্তমী আমার সেই সকল পাপ, রোগ ও শোক দূর করুন।'

ভারতচন্দ্র **সূর্যবন্দনা**-য় সূর্যকে এই ভয় ও পাপ হরণকারী রূপে বন্দনা করেছেন :

বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিকবর
স্মরিলে তোমায় পাপ দূরে যায়
আসরে সদয় হবে।

বিষ্ণু বন্দনা-র শুরুতেই ভারতচন্দ্র লিখছেন :

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভছটা
বনমালা নানা আভরণ॥

বিষ্ণু বন্দনার পর কবি দেবী **কৌষিকী-র বন্দনা** করেছেন :

কৌষিকী কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনী।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী॥

লক্ষ্মী-বন্দনা-য় 'রূপ গুণ জ্ঞান/যত যত স্থান/তুমি সকলের শোভা'...এই বর্ণনায় এসে মিলেছে বিষ্ণুপুরাণের ইন্দ্রকর্তৃক লক্ষ্মীস্তব, ব্রহ্মপুরাণের 'যদ্‌যদ্রম্যং সুন্দরং বা 'তত্তল্লক্ষ্মীবিজ্জৃম্ভিতম্' এবং কূর্মপুরাণের 'লক্ষ্মীশ্চারুরূপাণাম'-এর স্তব।

সরস্বতী বন্দনা-য় আঠার পুরাণের প্রসঙ্গ এনেছেন—

আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান॥

'বেদবিদ্যা তন্ত্র যন্ত্র, বেণু বীণা আদি যন্ত্র, নৃত্যগীতবাদ্যের ঈশ্বরী'—অংশে মিলিত হয়েছে বেদের 'সুনৃতানাং চেতংতী সুমতী নাম' অংশ। তন্ত্র ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সরস্বতীস্তোত্র-ও প্রভাব বিস্তার করেছে এই অংশে।

তবে বন্দনা-অংশে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে কবির অন্নপূর্ণা বন্দনা। বেদ ও পুরাণের এক অকৃত্রিম অভিন্ন দেবীকেই তাঁর মঙ্গলকাব্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গ্রহণ করেছেন কবি—

আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান॥
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণগান
নায়কের পূর্ণ কর আশ।

বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তি হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া, তিনিই অন্নপূর্ণা। *অন্নদামঙ্গল*-এর

'গীতারম্ভ'-অংশে বিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্যকে ব্যক্ত করেছেন কবি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আবর্তে ঘনীভূত বিশ্বজীবনরহস্য। আর সেই রহস্যভেদেই মেলে মোক্ষসাধনার প্রকৃত পথের সন্ধান। এই মোক্ষতত্ত্বের মধ্যেই আছে শিব-শক্তিতত্ত্ব। দেবী অন্নপূর্ণার মহিমাকথায় তাই শিব-শক্তিতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কাহিনী আগাগোড়া মণ্ডিত হয়ে আছে পুরাণানুগ দেবতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ও মোক্ষতত্ত্বের আলোচনায়। এই সবক্ষেত্রেই সৃষ্ট হয়েছে পুরাণোক্তির প্রতিধ্বনিতে নিরন্তর আবর্তিত এক পৌরাণিক ভাবমণ্ডল। পুরাণে বন্দিত শিব :

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম্

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে শিব অভিব্যক্ত হয়েছেন এইভাবে :

মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।

'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' অংশে 'শিবশক্তি' তত্ত্বের মেলবন্ধন আরো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল। বস্তুত এই অংশেই দেবখণ্ডের যথার্থ সূত্রপাত । সতীর দক্ষালয় যাত্রা বর্ণনায় শিব দেখছেন দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত দেবী জগতের সমস্ত বস্তুতে প্রতিবিম্বিত :

এ কি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥

ব্যাস-প্রসঙ্গে জরতীবেশে দেবীর ছলনায় ব্যাসের সর্বস্ব-পণ করা সাধনা বিফল হয়ে যাওয়ার পরও ব্যাসদেব দেবীর স্বরূপমায়ার যে পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন—

প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্মস্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥

সেখানে প্রতিধ্বনিত বিষ্ণুপুরাণের উক্তি 'হেতের্ভূতমশেষস্য প্রকৃতি পরমামূলে'। শিবশক্তি যে এক ও অভিন্ন, শিববিরোধী দ্বিতীয় কাশীনির্মাণের সাধনায় আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ যে পাওয়া যায় না, দেবীমায়া যে অশেষ অপার, এবং দেবীকৃপাসংযোগ ছাড়া যে জগতের কোনো ক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না—এই উপলব্ধি ব্যক্ত করলেন ব্যাসদেব :

বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥

পুরাণান্তর্গত শিবকথিত আত্মস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্যাখ্যায় এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়...

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ
শক্তিযুক্তো যদা দেবী শিবোহহং সর্বকামদঃ॥

হরগৌরীর রঙ্গবিলসিত প্রমোদকাম কথোপকথনেও এভাবেই পুরুষ-প্রকৃতির অদ্বয়তত্ত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে :

হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যে মোক্ষতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। ব্যাসদেবের সমস্ত উপদেশ ও দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সাধনায় মূল লক্ষ্য ছিল মোক্ষলাভ। সেই মোক্ষের কথায় ব্যাস যখন বলেন—'মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম' তখন কাশীখণ্ডের ব্যাসোক্তিই স্মরণে আসে—'একঃ কামপ্রদশ্চক্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোহচ্যুতঃ'। একদিকে অধ্যাত্ম রামায়ণের কথার প্রতিধ্বনি করে ব্যাস যেমন বলেন, 'কাশীতে মরিলে জীব : রাম নাম দিয়া শিব : কত কষ্ট মোক্ষ দেন শেষে।' তেমনি

কাশীখণ্ডের বচন উদ্ধার করে বলেন, 'তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে'। এমন যে মোক্ষস্থান কাশী তার মাহাত্ম্যগাথা রচনা করেছেন ভারতচন্দ্র 'শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞানবাণী কূলে রয়ে, সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না যাব।' অকৃত্রিম ভক্তিরসাশ্রিত এই চরণে সুস্পষ্ট অনুরণন শোনা যায় 'মৃগেন্দ্র আগম'-এর বাণীর : 'নিরন্তরং শিবোঽহমিতি ভাবনাপ্রবাহেন শিথিল পাশ তয়া গত পশুভাব উপাসকঃ শিব এব ভবতি।'

এই দেবশ্রেষ্ঠ শিব, দেবখণ্ডকাহিনীর মূল দেবতা এবং দেবী স্বয়ং অন্নপূর্ণা—উভয়ই অনিঃশেষ গুণ বৈচিত্র্যে ভূষিত। বিশেষত শিব চরিত্র, পৌরাণিক ও লৌকিক—দুই বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে দ্যোতিত। আর্য ও অনার্য দ্বিবিধ গুণসংমিশ্রণে রচিত শিব। পৌরাণিক ত্রিদেবতার মধ্যে তাই বৈপরীত্যের মিশ্রণে সর্বাধিক জটিলস্বভাব দেবতা। ভারতচন্দ্রও অনুরূপভাবে যেমন তাঁর লৌকিক রঙ্গ-পরিহাসময় জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি তাঁর পৌরাণিক মহিমাও অনবদ্যভাবে স্ফুরিত করেছেন। দক্ষের শিবনিন্দায় শিব চরিত্রের যে পরিচয় পরিস্ফুট ব্যাজস্তুতি অলংকারের মহিমায় তার প্রায় সমস্তটাই স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে বর্ণিত দক্ষের শিবনিন্দার অনুরূপ। ব্যাসকৃত শিবনিন্দা, 'যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল তাহারে বেড়িয়া ফিরে'—এই উক্তি কাশীখণ্ডের

ডমড্ডমরুকবপ্রহস্তাগ্রঃ খণ্ড চন্দ্রভৃৎ
তাণ্ডবাড়ম্বররুচির সর্বামঙ্গলবেষ্টিতঃ।। উক্তির অনুরূপ

এ হেন শিব যখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ স্বামী, চণ্ডী স্ত্রীর প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতায় ভিক্ষায় বহির্গত—তখন তাঁর লৌকিক রূপটি চমৎকার ফুটেছে .

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।

তবু তখনও সব লৌকিক দেবস্বভাবের আবরণ ভেদ করে পৌরাণিক মহিমান্বিত শিব, ক্ষুধাদীর্ণ কণ্ঠে হলেও চিৎকার করে ঘোষণা করেন চৈতন্যের মহিমা :

চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ।।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ভগবান কৃষ্ণ এমন কথাই শুনিয়েছিলেন অর্জুনকে :

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'শিব-ব্যাসে কথপোকথন' প্রসঙ্গের প্রথমাংশ পুরোপুরি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে নেওয়া। কিন্তু উত্তরাংশে ব্যাসের 'কাশী নির্ম্মাণো'দ্যোগের ও ব্যর্থতার চিত্রণে কবি তাঁর প্রতিভা ও কল্পনার মৌলিকতা দেখিয়েছেন। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদের প্রতি ব্যাসের উপদেশ :

সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্বদেবে হরি।।
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে।।

এই অংশে অবিকল প্রতিধ্বনিত হয়েছে কাশীখণ্ডের ব্যাসকথিত উপদেশ :

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ।
ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ।।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণেষু চ ভারতে।
আদি মধ্যাবসানেষু হরিরেকোহত্র নাগরঃ।।

অতঃপর নন্দীর ক্রোধে ব্যাসের ভূজস্তম্ভ ও বাক্‌স্তম্ভ বর্ণনায় কাশীখণ্ডের-ই বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন কবি। ব্যাসের এরূপ দুর্গতিতে অলক্ষ্যে বিষ্ণু এসে ব্যাসকে তিরস্কার করলেন। বাক্‌স্তম্ভ দূর করে আদেশ দিলেন শিবস্তুতি করতে ... 'ইদানীং স্তুহি তং শম্ভুং যদি মে শুভমিচ্ছসি'। ব্যাসের তপস্যায় তুষ্ট নন্দী তাঁর ভূজস্তম্ভ দূর করলেন। এবার গোঁড়া শিবভক্ত হয়ে উঠলেন ব্যাসদেব।

তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস।।
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপাল ফলকে।।

কাহিনীর এই স্থানে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন ভারতচন্দ্র। কাশীখণ্ডে শিব অতঃপর ব্যাসের শিবভক্তিব গভীবতা পরীক্ষা করার জন্য তার ভিক্ষা বারণ করেছিলেন কাশীতে। কিন্তু ভারতচন্দ্র ব্যাসের ভিক্ষা বারণের কারণ দেখিয়েছেন তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামিকে। শিব বললেন, 'দেখ দেখ অহে নন্দী ব্যাসের দুর্দ্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হৈল গোঁড়া শৈব।।' সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদী কবির কাব্যে শিব আরও বললেন 'মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমি তো তাহার পূজা গ্রহণ না করি।।' .. 'হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।।' অবশ্যই কবির এই উক্তিগুলি নিজস্ব কল্পনা নয়। কাশীখণ্ডে, শিবপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে এই অভেদবাণী ঘোষিত হয়েছে। যেমন *শিবপুরাণ*-এ শিবকর্তৃক কথিত হয়েছে :

মমৈব হৃদয়ে বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে হ্যহম্।
উভরোন্তরং বো বৈ ন জানাতি মনো মম।।

কিন্তু মহাজ্ঞানী ব্যাসের এ সময়ে এমনই মোহ উৎপন্ন হয়েছে যে, অহংকারে অভিমানে তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রকে বারংবার পরিবর্তন করতেও যেন প্রস্তুত। তাই ভিক্ষা না পেয়ে বিষণ্ন ও ক্ষুব্ধ শিব 'চেত রে চেত রে চিত' বলে অধ্যাত্ম-চৈতন্যের জয় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু উপবাসী ব্যাস ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে অহংকারমত্ততায় কাশীতে শাপ দিলেন :

তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ।।
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী।।
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে।।
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে।।

এই শাপের সমস্তটাই কাশীখণ্ডের অবিকল প্রতিধ্বনি।...

যদ্যন্যত্রার্জ্জিতং পাপং তৎ কাশীদর্শনাদ ব্রজেৎ।

কিন্তু এরপরও ব্যাস ভিক্ষা পেলেন না। তিনদিন উপবাসী ব্যাস যখন ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ক্ষিপ্ত তখন দেবী অন্নপূর্ণা স্বয়ং ব্যাসের কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর গৃহে অতিথি হবার

আমন্ত্রণ জানালেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ ব্যাস 'কাশীখণ্ডে' কথিত ভাষাতেই সপ্রসন্ন বন্দনা করলেন দেবীকে :

শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে কেবা অন্ন দেই॥

কাশীখণ্ডে ব্যাস বলেছেন—'বারাণস্যাঃ কিমথবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্বম্। কিংবা নির্বাণলক্ষ্মীস্ত্বং যা কাশ্যাং পরিগীয়তে॥'

ব্যাস অতঃপর গেলেন অন্নপূর্ণাভবনে। সেখানে পরম পরিতোষ সহকারে আহারের পর শুরু হল বৃদ্ধবেশী শিবের সঙ্গে কথোপকথন। ভারতচন্দ্র দেবীর পরিবর্তে শিবের মুখেই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন :

তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম তার।
কি কর্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥

ব্যাসদেব উত্তরে সৎ জীবনযাপনের কথা বলে সন্ন্যাসকেই শ্রেষ্ঠ তপস্যা বললেন, 'তপস্যার নানাভেদ প্রধান সন্ন্যাস'। তখন ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন ব্যাসকে শুভবুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন করাতে শিবের ভূমিকা এবং সমন্বয়ধর্মে স্থিত করতে শিবের ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হল :

কি মর্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
....
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এইক্ষণে বারাণসী হইতে দূর হও॥

—সর্বত্রই কাশীখণ্ডের অনুসরণ। এরপর ভারতচন্দ্রের নিজস্ব কাহিনী কল্পনা।

'কাশীপরিক্রমা' নামে এক অর্বাচীন গ্রন্থে ব্যাসকাশী নির্মাণের এবং অন্নদার ছলনার যে ইঙ্গিত আছে ভারতচন্দ্র সেই সূত্র থেকে কিছু রসদ সংগ্রহের পাশাপাশি স্বকীয় উদ্ভাবনা ও সংযোজনার ওপরেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ব্যাসচরিত্র নির্মাণে অপমানিত ও বিতাড়িত ব্যাসদেবের চরিত্রায়ণে আধুনিক ব্যক্তিত্বের আত্মাভিমান পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সংকল্প নিয়ে ব্যাসদেব গঙ্গার কাছে গিয়ে তাঁর যে স্তব করলেন, কিংবা ব্যাসের প্রতি গঙ্গার বক্রকটাক্ষপাতে কাশী ও কাশীনাথের যে গুণাবলী কথিত—সেই সব ক্ষেত্রেই পুরাণানুসরণ ঘটিয়েছেন কবি। অন্যদিকে ব্যাসকৃত গঙ্গা তিরস্কার এবং গঙ্গাকৃত ব্যাস তিরস্কার উভয়ই মহাভারতকথার ছায়াবলম্বনে তির্যক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস। অতঃপর ব্রহ্মা যখন ব্যাসকে স্নিগ্ধকথায় বুঝিয়ে শান্ত করার সময়ে বলেন, 'অন্যের যে অমঙ্গল তারে সে মঙ্গল', তখন প্রতিধ্বনি শোনা যায় পাশুপাত সূত্রের বাণীর :

কচিৎ অমঙ্গলং মঙ্গলং ভবতি।

অবশেষে জরতীবেশিনী অন্নদার ছলনায় ব্যর্থ, সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব, তপোধন ব্যাসদেব মর্মান্তিক দুঃখে যখন—

শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥

বলে ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে প্রস্থান করলেন শ্রান্ত শূন্যতায় তখন এক নতুন পৌরাণিক

মহিমা যুক্ত হল ব্যাসের ট্র্যাজেডিতে ব্যাসকাহিনীর রসপরিণাম অন্যতর মাত্রা পেল। নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করা যায় না। মহাজ্ঞানী ব্যাসের এই মোহ যেন নিয়তিরই খেলা। সে খেলায় হেরে গিয়ে ব্যাসদেব প্রমাণ করলেন দেবমহিমার গুরুত্ব ও বিরাটত্ব।

দেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের যে দুটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী মঙ্গলকাব্যিক রীতিবদ্ধতায় এ-কাব্যে এসেছে তার মূলেও আছে পৌরাণিক হস্তক্ষেপ। মর্ত্যের হরিহোড় আর ভবানন্দ মজুমদার যথাক্রমে কুবেরের অনুচর বসুন্ধর এবং পুত্র নলকুবর। ঐশ্বর্যমত্ততা ও কামোন্মত্ততার দরুণ তাঁদের অভিশপ্ত করার পূর্বসূত্র কবি পেয়েছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের যমলার্জুন আখ্যান থেকে। হরিহোড়ের কাহিনীতে অতি অল্প পরিসরেই তাই দেবীপূজা প্রচার অসঙ্গতি দোষে পীড়িত হয়নি। পূর্ণ পৌরাণিক সঙ্গতি রেখেই দেবী ঘোষণা করতে পেরেছেন অন্নপূর্ণা স্তোত্রের কথা :

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমায় পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটি মুটা ধর যদি সোনা মুটা হবে॥

দেবীপূজা প্রচারিত হয়েছে দীন দরিদ্র থেকে অভিজাত সমাজে। হরিহোড়, ঈশ্বরী পাটুনি থেকে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে। পুরাণ-চেতনায় সমৃদ্ধ কবি লোকজীবনেরও নিপুণ কথাকার। তাই আরাধ্যা অন্নদা পৌরাণিক আবহে স্নান করেও গণজীবনের বন্দিতা হয়ে রইলেন।